৬। সূরা আনফালঃ ৫ম রুকু(৩৮-৪৪)আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ

৩৮. যারা কুফরী করে তাদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত হয় তবে যা আগে হয়ে গেছে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন; কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের রীতি তো গত হয়েছেই।

বিরত হয় অর্থঃ মুসলিম হয়ে যায়। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পুণ্যের রাস্তা অবলম্বন করবে, তাকে ঐ সকল পাপের জবাবদিহি করতে হবে না, যা সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে করেছে। আর যে ইসলাম গ্রহণ করার পরও পাপের পথ ছাড়বে না, তাকে পূর্বের ও পরের সকল আমলের ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম) এক অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘‘ইসলাম পূর্বের গোনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়। (আহমাদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলিয়াতে (অর্থাৎ কাফের অবস্থায়) যা করেছি, তার জন্য কি জবাবদিহি করতে হবে? তিনি বললেনঃ যদি কেউ ইসলামে সুন্দরভাবে আমল করে তবে জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হবে না। আর যদি খারাপ আমল করে তবে পূর্বাপর সবকিছুর জন্যই ধরা হবে। [বুখারীঃ ৬৯২১

ঈমান একটি স্থায়ী অঙ্গিকার, এ থেকে ফিরে যাওয়া(ইরতিদাদ) সাধারণ কুফরের চেয়েও ভয়াবহ কুফরী।

ঈমান আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যকার এক স্থায়ী অঙ্গিকারের নাম;জীবনের শেষ পর্যন্তই। যখনই ঈমানের সম্পদ পাওয়া গেল তখন থেকেই এর পুষ্টি ও বর্ধন, শক্তি ও সংস্কারে মগ্ন থাকা জরুরি। সবসময় সতর্ক থাকা চাই, এমন কোনো কথা বা কাজ যেন প্রকাশিত না হয়, যা ঈমান নষ্ট করে। আর আল্লাহর দরবারে তাঁর শেখানো দুআ করতে থাকা চাই-

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনপ্রবণ করো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।-আলে ইমরান ৩ : ৮

আল্লাহর কাছে ঐ বান্দার ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যে ঈমানের উপর অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে ঈমান থেকে সরে যায় সে তো দুই বিদ্রোহে লিপ্ত-কুফরের বিদ্রোহ ও ইরতিদাদের বিদ্রোহ।

অবিচল মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে-

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ l إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

* যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ' অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। * তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যা করত তার পুরস্কার স্বরূপ।-আল আহকাফ ৪৬ : ১৩-১৪

অন্য আয়াতে আছে-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا l الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ l مَا تَدَّعُونَ

যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'', অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়, ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। * 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। * এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।-হামীম আসসাজদা ৪১ : ৩০-৩২

পক্ষান্তরে যারা ঈমানের উপর কায়েম থাকে না; বরং পশ্চাদপসরণ করে কিংবা বারবার এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করে এদের কাছে দ্বীন এক খেলার বস্ত্ত! ইরতিদাদ (সত্য ধর্ম থেকে পিছু হটা) মূলত মুনাফিকদের কাজ। এর দ্বারা তারা দুর্বল ঈমানদারদের সংশয়গ্রস্ত করতে চায়। কুরআন মাজীদে তাদের এই অপকৌশলের বিবরণ আছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- আলে ইমরান ৩ : ৭২-৭৩)

''আর কিতাবীদের একদল বলল, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তোমরা দিনের শুরুতে তাতে ঈমান আন এবং দিনের শেষে কুফরী কর; যাতে তারা ফিরে আসে। আর যে তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাদেরকে ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করো না বলুন, নিশ্চয় আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। এটা জন্যে যে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেয়া হবে অথবা তোমাদের রবের সামনে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে। বলুন, নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ্র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছে তা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ''। আলে ইমরানঃ৭২-৭২

যে কোনো ইরতিদাদ সাধারণ কুফর থেকে ভয়াবহ। সাধারণ কুফর তো সত্য দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা বা গ্রহণ না করা, কিন্তু ইরতিদাদ নিছক বিমুখতাই নয়, এ হচ্ছে বিরুদ্ধতা। সত্য দ্বীন গ্রহণ করার পর তা বর্জনের অর্থ ঐ দ্বীনকে অভিযুক্ত করা, যা নির্জলা অপবাদ। বরং ইরতিদাদ তো সত্য দ্বীনের প্রতি বিরুদ্ধতার পাশাপাশি 'ইফসাদ ফিল আরদ' (ভূপৃষ্ঠে দুস্কৃতি) ও বটে। বিশেষত মুরতাদ (সত্য দ্বীন ত্যাগকারী) যখন কটাক্ষ-কটূক্তি এবং অবজ্ঞা বিদ্রূপে লিপ্ত হয়। এ তো সরাসরি 'মুহারিব' (যুদ্ধঘোষণাকারী) ও 'মুফসিদ ফিল আর্দ' (ভূপৃষ্ঠে দুস্কৃতিকারী)

যদি তারা কুফর ও শত্রুতার পথ ত্যাগ না করে, তাহলে আজ হোক বা কাল হোক আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন

নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। আর তারাই পথ ভ্রষ্ট। আলে ইমরান ৯০

যারা মুরতাদ হওয়ার পর তাওবা করার তাওফীক লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং কুফরীর উপরেই যাদের মৃত্যু হয়েছে। কুরআনে মহান আল্লাহ বারবার তওবার গুরুত্ব এবং তা কবুল করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, [أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ] অর্থাৎ, তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করে থাকেন এবং তিনিই দান-খয়রাত গ্রহণ করেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন তওবা কবুলকারী ও পরম করুণাময়? (সূরা তওবা ১০৪ আয়াত)

[وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ] অর্থাৎ, তিনি তাঁর দাসদের তওবা গ্রহণ করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। (সূরা শূরা ২৫ আয়াত)

হাদীসসমূহে তওবা কবুল হওয়ার কথা বড়ই গুরুত্বের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কাজেই এই আয়াতে যে তওবার কথা বলা হয়েছে, তা হল একেবারে শেষ মুহূর্তের তওবা, যা কবুল হবে না। যেমন, কুরআনের অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে,

[وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ] {النساء: 18} ‘‘আর এমন লোকদের জন্য কোন তওবা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়ে যায়, তখন বলে, আমি এখন তওবা করছি। হাদীসেও আছে যে, ‘‘অবশ্যই আল্লাহ বান্দার তওবা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কবুল করে থাকেন। (মুসনাদ আহমাদ-তিরমিযী)

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ ٣٩ : ٨ بَصِيرٌ

৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেৎনা দূর হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তারপর যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, মদীনা শরীফে জিহাদের হুকুম এটাই প্রথম অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শুধুমাত্র ঐ লোকদের সাথে যুদ্ধ করতেন যারা তার সাথে যুদ্ধ করতো। যারা তার সাথে যুদ্ধ করতে না তিনিও তাদের সাথে যুদ্ধ করতেন না। অবশেষে সূরা-ই-বারাআত অবতীর্ণ হয়।

শরীয়তে জিহাদের উদ্দেশ্য কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। এ কারণেই সাধারণ অবস্থায় কেউ যদি কুফরেই অবিচল থাকতে চায়, তবে সে জিয়্যার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তা থাকতে পারে। জাযিরাতুল আরবের বিষয়টা আলাদা। কেননা এটা এমন দেশ, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি পাঠানো হয়েছে এবং যেখানকার লোকে তার মুজিযাসমূহ চাক্ষুষ দেখেছে ও

তাঁর শিক্ষা সরাসরি শুনেছে। এরূপ লোক ঈমান না আনলে পূর্বেকার নবীগণের আমলে তো ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে যেহেতু সে রকম আযাব স্থগিত রাখা হয়েছে, তাই আদেশ করা হয়েছে, জাযিরাতুল আরবে কোনও কাফির নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারবে না। এখানে তার জন্য তিনটি উপায়ই আছে হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত জাযিরাতুল আরব ত্যাগ করে চলে যাবে অথবা যুদ্ধে কতল হয়ে যাবে।

সূরা তাওবায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা জাযিরাতুল আরবকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বানিয়েছেন। তাই এখানকার জন্য বিধান হল যে, এখানে কোন কাফের ও মুশরিক স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, নয়ত অন্য কোথাও চলে যাবে। সে কারণেই এ আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে, জাযিরাতুল আরবের কাফের ও মুশরিকগণ যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লিখিত দু' টি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জাযিরাতুল আরবের বাইরে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। সেখানে অমুসলিমদের সাথে বিভিন্ন রকমের চুক্তি হতে পারে।

এ আয়াতে বর্ণিত ফেৎনা ও দ্বীন শব্দ দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবহার অনুযায়ী আয়াতে শব্দ দুটির একাধিক অর্থ করা হয়ে থাকেঃ

এক. ফেৎনা অর্থ কুফর ও শির্ক আর দ্বীন অর্থ ইসলাম। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, মুসলিমদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না শির্ক ও কুফর নিঃশেষিত হয়ে যায়। [তাবারী; ইবন কাসীর] এক্ষেত্রে এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হবে কিয়ামত পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না দুনিয়া থেকে শির্ক ও কুফর নিঃশেষিত না হবে বা শির্কের প্রভাব কমে না যাবে।

দুই. যা আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমূখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে, ফেৎনা হচ্ছে দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, পক্ষান্তরে দ্বীন' শব্দের অর্থ প্রভাব ও বিজয়। মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলিমদের উপর এ ফেৎনা অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনায় হিজরত করেন, তারপরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে যে, মুসলিমগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তারা অন্যায়-অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন, মুসলিম আপন দ্বীন পালন করতে কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয় [ইবন কাসীর]

তিন. আয়াতের তৃতীয় আরেকটি অর্থ হচ্ছে, এখানে জিহাদ করার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যের নেতিবাচক দিক হচ্ছে ফেৎনা না থাকা আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে দ্বীন সম্পূর্ণরূপে কেবল আল্লাহর জন্য হবে। কেবলমাত্র এ সর্বাত্মক উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই করাই মুসলিমদের জন্য জায়েয বরং ফরয। তা ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করা মোটেই জায়েয নহে। তাতে অংশগ্রহণও ঈমানদার লোকদের শোভা পায় না। এ মতের সমর্থন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসে পাই, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ হে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কি? আমাদের কেউ কেউ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ

করে, আবার কেউ নিজস্ব অহমিকা (চাই তা গোত্রীয় বা জাতিগত যাই হোক তা) ঠিক রাখার জন্য যুদ্ধ করে। তখন রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর প্রতি মাথা উঠিয়ে বললেনঃ যে আল্লাহর কালেমা (তাওহীদ/দ্বীন/কুরআন) কে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে সে মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল। [বুখারীঃ ১২৩] কোন কোন মুফাসসির এখানে উপরোক্ত তিনটি অর্থই গ্রহণ করেছেন। [মুয়াস্সার]

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্তভাবে দূরীভূত না হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমরা ছাড়া আর কারও উপর আক্রমণ নেই।বাকারাঃ১৯৩

وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ ۚ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٨ : ٤٠

৪০. আর যদি তারা মুখ ফিরায় তবে জেনে রাখ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

যদি তারা মুখ ফিরায় অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ না করে এবং কুফরীর ও মুমিনদের বিরোধিতার উপর অবিচল থাকে তাহলে মুমিনদের শত্রুদের উপর আল্লাহই সাহায্যকারী এবং মুমিনদের রক্ষক ও হিফাযতকারী।

সুতরাং সফলকাম সেই হবে, যার অভিভাবক আল্লাহ এবং বিজয় সেই লাভ করবে, যার সাহায্যকারী আল্লাহ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّٰصِرِينَ বরং আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।আলে ইমরানঃ১৫০

وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّ كَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا

বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট। নিসাঃ৪৫

যারা দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের সাথে যদি একইওভাবে চলতে চায় ক্যা তাহলে অন্য আয়াতে(বাকারাঃ১২০) ধমকি দেওয়া হচ্ছে যে, যদি জ্ঞান আসার পরেও তুমি ঐ শ্রেণীর ভ্রষ্ট লোকদেরকে কেবল সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এখানে আসলে উম্মতে মুহাম্মাদীকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, বিদআতী ও ভ্রষ্ট লোকদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য তারা যেন এমন কাজ না করে এবং কোন দ্বীনী ব্যাপারে তোষামোদ ও তার অযথা অপব্যাখ্যা না করে।

আর ইয়াহুদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন। বলুন নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান আসার পরও, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং থাকবে না কোন সাহায্যকারীও। বাকারাঃ১২০

নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র মুকাবেলায় আপনার কোনই কাজে আসবে না; আর নিশ্চয় যালিমরা একে অন্যের বন্ধু; এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু। জাসিয়াঃ ১৯

৮ : ৪১ ۞ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

৪১. আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা গনীমত হিসেবে লাভ করেছ, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং সফরকারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহতে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু’ দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

‘গনীমতের মাল’ থেকে সেই মাল উদ্দেশ্য যা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর লাভ হয়। পূর্বের উম্মতে এই মাল বিতরণের পদ্ধতি এই ছিল যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কাফেরদের নিকট হতে লাভ করা সমস্ত মাল-সম্পদকে এক জায়গায় জমা করা হত, আর আসমান হতে আগুন এসে তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত। কিন্তু মুসলিম উম্মতের জন্য এই গনীমতের মাল আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন। আর যে মাল দুই দলের সন্ধি চুক্তির ভিত্তিতে বিনা যুদ্ধে অথবা জিযিয়া কর ও খাজনা আদায়ের মাধ্যমে লাভ হয় তাকে ‘ফাই-এর মাল’ বলা হয়।

এখানে জিহাদের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গণীমতের হকদারদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সমস্ত সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে। এর চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তাঁদের মধ্যেও পদাতিক (পায়ে হাঁটা ব্যক্তিদের)-কে এক ভাগ এবং অশ্বারোহীকে তিন ভাগ দেওয়া হবে।

আর বাকী এক(এক ভাগ) পঞ্চমাংশ পাঁচভাগে ভাগ করা হবে।

প্রথমভাগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এ অংশ মুসলিমদের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষনে ব্যয় হবে।

দ্বিতীয়ভাগ রাসূলের স্বজনদের জন্য নির্ধারিত। তারা হলেন ঐ সমস্ত লোক যাদের উপর সদকা খাওয়া হারাম। অর্থাৎ বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব। কারণ তাদের দেখাশুনার দায়িত্ব রাসূলের ছিল।তিনি তার নবুওয়াতের কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকায় তাদের জন্য এ গণীমতের মাল থেকে দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

তৃতীয়ভাগ ইয়াতিমদের জন্য সুনির্দিষ্ট।

চতুর্থভাগ ফকীর ও মিসকিনদের জন্য,

আর পঞ্চম ভাগ মুসাফিরদের জন্য। [ইবন কাসীর] ইবন তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পুরো এক পঞ্চমাংশই বর্তমানে ইমামের কর্তৃত্বে থাকবে। তিনি মুসলিমদের অবস্থা অনুযায়ী কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবেন। [ইবন কাসীর] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, গণীমতের মাল যদিও পূর্বে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে শুধু আল্লাহ ও তার

রাসূলের বলা হয়েছে তবুও তা মূলতঃ মুসলিমদের মধ্যেই পুনরায় বন্টন হয়ে গেছে। রাসূল তার জন্য তার জীবদ্দশায় যা কিছু পেতেন তাও বর্তমানে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

ইবন তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পুরো এক পঞ্চমাংশই বর্তমানে ইমামের কর্তৃত্বে থাকবে। তিনি মুসলিমদের অবস্থা অনুযায়ী কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবেন। [ইবন কাসীর] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, গণীমতের মাল যদিও পূর্বে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে শুধু আল্লাহ ও তার রাসূলের বলা হয়েছে তবুও তা মূলতঃ মুসলিমদের মধ্যেই পুনরায় বন্টন হয়ে গেছে। রাসূল তার জন্য তার জীবদ্দশায় যা কিছু পেতেন তাও বর্তমানে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

‘ফায়সালার দিন’ বলতে হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন, বদর যুদ্ধের দিন। এ যুদ্ধ সন ২ হিজরী, রমযানের ১৭ তারীখে ঘটেছিল। সেই দিনটিকে ‘ফায়সালার দিন’ এই জন্য বলা হয় যে, এটা ছিল কাফের ও মুসলিমদের মাঝে প্রথম যুদ্ধ এবং তাতে মুসলিমদেরকে বিজয়ী করে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মই হল সত্য ধর্ম আর কুফর ও শিরক হল বাতিল ধর্ম।

এখানে ‘যা অবতীর্ণ’ বলতে ফিরিশতা এবং অলৌকিক কিছু বিষয় ইত্যাদি অবতীর্ণ করাকে বুঝানো হয়েছে, যা বদর যুদ্ধের দিন ঘটেছিল।

إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَٱخْتَلَفْتُمْ فِى ٱلْمِيعَٰدِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ٨ : ٤٢

৪২. স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল দূর প্রান্তে আর আরোহী দল ছিল তোমাদের থেকে নিম্নভূমিতে। আর যদি তোমরা পরস্পর যুদ্ধ সম্পর্কে কোন পূর্ব সিদ্ধান্তে থাকতে তবে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমরা মতভেদ করতে। কিন্তু যা ঘটার ছিল, আল্লাহ্ তা সম্পন্ন করলেন, যাতে যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর জীবিত থাকে; আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

دُنيا শব্দটির উৎপত্তি دُنُو থেকে, যার অর্থঃ নিকটে। এখানে ‘নিকট প্রান্ত’ বলে সেই প্রান্তকে বোঝানো হয়েছে যেটা মদীনা শহর থেকে নিকটেই ছিল। আর قصوى বলা হয় দূরকে। কাফেররা সেই প্রান্তে ছিল, যা মদীনা শহর থেকে দূরে অবস্থিত ছিল।

আরোহী দল বলে এখানে মক্কার কুরাইশ কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে। যাদের নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান, যারা ব্যবসায়ী পণ্য নিয়ে সমুদ্রের পাশ ঘেঁষে যাচ্ছিল। [ইবন কাসীর]

বিনা ঘোষণায় কাফের ও ঈমানদারদেরকে বদরের এ যুদ্ধে নিয়ে আসার পিছনে কি রহস্য রয়েছে আল্লাহ্ তা’আলা এখানে তাই ব্যক্ত করছেন। আর তা হলো, যাতে তোমাদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দেই, হকের ঝান্ডা বাতিলের উপর বুলন্দ করে দেখাই, ফলে কোনটা হক এবং কোনটা বাতিল তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম ও তার অনুসারীদের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং কুফর-শির্ক ও তাদের অনুসারীরা অসম্মানিত হয়। [ইবন কাসীর]

যাতে অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, মুসলিমরা হকের উপর আছে ফলে তাদের বিজয় এসেছে, আর কাফেররা বাতিলের উপর আছে ফলে তাদের বিপর্যয় ঘটেছে।

সুতরাং যারা জীবিত আছে তারা দলীল প্রমাণসহ হক বেছে নিতে পারে। আর তাদের মধ্যে যে বাতিল বেছে নেয় সে তার স্বইচ্ছায় হক স্পষ্ট হওয়ার পরও বাতিলকে গ্রহণ করে নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনলো। মূলতঃ বদরের যুদ্ধের পর অধিকাংশ মানুষের কাছে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আজও মানুষ বদর যুদ্ধের বিজয়কে হক ও বাতিল চেনার ক্ষেত্রে এক বিরাট নিদর্শন বলে বিশ্বাস করে।

প্রমাণ হয়ে যাবে যে, যে জীবিত আছে তার জীবিত থাকাই উচিত ছিল এবং যে ধ্বংস হয়ে গেছে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়াই সমীচীন ছিল। এখানে জীবিত থাকা ও ধ্বংস হওয়া বলতে ব্যক্তিদেরকে নয় বরং ইসলাম ও জাহেলিয়াতকে বুঝানো হয়েছে।

إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ٨ : ٤٣
وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

৪৩. স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, তারা সংখ্যায় কম; যদি আপনাকে দেখাতেন যে, তারা সংখ্যায় বেশী তবে অবশ্যই তোমরা সাহস হারাতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই তিনি অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

এটা এমন এক সময়ের কথা, যখন নবী (সা.) মুসলমানদের নিয়ে মদীনা থেকে বের হচ্ছিলেন অথবা পথে কোন মনযিলে অবস্থান করছিলেন তখন কাফেরদের যথার্থ সৈন্য সংখ্যা জানা যায়নি। এ সময় নবী (সা.) স্বপ্নে কাফেরদের সেনাবাহিনী দেখলেন। তাঁর সামনে যে দৃশ্যপট পেশ করা হয় তাতে শত্রু সেনাদের সংখ্যা খুব বেশী নয় বলে তিনি অনুমান করতে পারলেন। এ স্বপ্নের বিবরণ তিনি মুসলমানদের শুনালেন। এতে মুসলমানদের হিম্মত বেড়ে গেলো এবং তারা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলো।

যুদ্ধ শুরুর আগে হানাদার কাফেরদের সংখ্যা কত তা যখন মুসলিমদের জানা ছিল না, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তাদের সংখ্যা অল্প। তিনি সে স্বপ্ন সাহাবায়ে কিরামের সামনে বর্ণনা করলেন। এতে তাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, নবীর স্বপ্ন যেহেতু বাস্তববিরোধী হতে পারে না, তাই দৃশ্যত বোঝা যাচ্ছে তাকে সৈন্যদের একটা অংশ দেখানো হয়েছিল, তিনি সেই অংশ সম্পর্কেই জানিয়েছিলেন যে, তারা অল্পসংখ্যক। কেউ বলেন, স্বপ্নে যে জিনিস দেখানো হয়, তার সম্পর্ক থাকে উপমা জগত (আলম-ই-মিছাল)-এর সাথে। যা দেখা যায়, উদ্দেশ্য হুবহু সেটাই হয় না। এ কারণে স্বপ্নের তাবীর করার প্রয়োজন থাকে। সুতরাং স্বপ্নে যদিও গোটা বাহিনীর সংখ্যা অল্প দেখানো হয়েছিল, কিন্তু সে অল্পতার আসল ব্যাখ্যা ছিল এই যে, সৈন্য সংখ্যা বেশি হলেও তার গুরুত্ব বড় কম। এ ব্যাখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল। সুতরাং সে দৃষ্টিতেই তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনে এ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাতে তাদের সাহস ও উদ্যম বৃদ্ধি পায়।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ ৪৪ : ৮
مَفْعُولاً ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

৪৪. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন, যাতে আল্লাহ সম্পন্ন করেন এমন কাজ যা ঘটারই ছিল। আর আল্লাহর দিকেই সব বিষয় প্রত্যাবর্তন করা হয়

যাতে সেই কাফেররাও তোমাদের ভয়ে পিছু হটে না যায়। প্রথম ঘটনাটি ছিল স্বপ্নের। আর এটা ঠিক লড়াইয়ের সময় দেখানো হয়েছিল, যেমন কুরআনের শব্দাবলী হতে এ কথা স্পষ্ট হয়। পরন্তু এই ব্যাপারটি শুরুর দিকে ছিল। কিন্তু যখন পূর্ণভাবে লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল তখন কাফেররা মুসলিমদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখতে পেল; যেমন সূরা আলে ইমরানের ১৩নং আয়াত থেকে সে কথা জানা যায়।

“দু’ টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একদল যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে, অন্য দল ছিল কাফের; তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দেখছিল তাদের দ্বিগুণ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে”। আলে ইমরানঃ ১৩

এ যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাতশ উট ও একশ’ অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশ’ র কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উট, দুটি অশ্ব, ছ’ টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলিমদের আধিক্য কল্পনা করে কাফেরদের অন্তর উপর্যুপরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলিমগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ তা’আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তারা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ওয়াদা- “যদি তোমাদের মধ্যে একশ ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশ’ র বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে” [সূরা আল-আনফালঃ ৬৬]-এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহর সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফেরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলিমদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেত, তবে তাদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়াটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। [সীরাতে ইবন হিশাম]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে সংখ্যা বেশী দেখাবার হিকমত এই ছিল যে, যাতে অধিক সংখ্যা দেখে তাদের অন্তরে মুসলিমদের ত্রাস ও ভীতি সঞ্চার হয় এবং তার ফলে কাফেরদের মধ্যে কাপুরুষতা, ভীরুতা ও নিরুদ্যমতা এসে যায়। আর এর বিপরীত প্রথমে কম সংখ্যা দেখানোতে হিকমত এটাই ছিল যে, তারা যেন যুদ্ধ থেকে দূরে সরে না পড়ে।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, বদরের দিন কাফেরদেরকে আমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখানো হয়েছিল। এমনকি আমার পাশের লোককে বলছিলাম যে, তুমি তাদের সংখ্যা সত্তর দেখতে পাও? সে বললঃ আমি

একশত দেখতে পাচ্ছি। আব্দুল্লাহ বলেনঃ শেষে আমরা তাদের একজনকে বন্দী করে জিজ্ঞাসা করলে সে তাদের সংখ্যা এক হাজার বলে জানায়। [তাবারী]

এসবের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ তাআলা যে ফায়সালা করে রেখেছিলেন তা পূরণ হয়ে যায়। এই জন্য তিনি তার কারণ ও উপকরণ সৃষ্টি করে দিলেন।

এ যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় বছরে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। কয়েক দিক দিয়ে এটি ছিল বড়ই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ।

প্রথমতঃ এটি ছিল প্রথম যুদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই ছিল এই যুদ্ধ। সিরিয়া থেকে বাণিজ্য-সামগ্রী নিয়ে মক্কাগামী আবূ সুফিয়ানের কাফেলার পথ অবরোধ করার জন্য মুসলিমরা বের হয়েছিলেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান টের পেয়ে যায় এবং সে তার কাফেলা নিয়ে অন্য পথ ধরে চলে যায়। এদিকে মক্কার কাফেররা নিজেদের শক্তি ও সংখ্যার আধিক্যের দাম্ভিকতায় মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য বদরের ময়দান পর্যন্ত যাত্রা করে এবং সেখানে সর্বপ্রথম এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তৃতীয়তঃ এই যুদ্ধে মুসলিমরা আল্লাহর বিশেষ সাহায্য লাভে ধন্য হন।

চতুর্থতঃ এতে কাফেররা এমন শিক্ষামূলক পরাজয় বরণ করে যে, আগামীর জন্য তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়।